Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 17 –29
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

নাথপন্থা ও নাথসাহিত্য : একটি বহুমাত্রিক অন্বেষণ

ব্রতবাণী ঠাকুর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: bratabani9@gmail.com

Keyword
নাথসাহিত্য, গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান, বৌদ্ধতন্ত্র, ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক সাহিত্য, নাথপন্থা, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ

Abstract
মধ্যযুগের বাংলার ধর্মীয় ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথপন্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাথসাহিত্যে উল্লেখ আছে যে যোগীগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের মাধ্যমেই এই মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নাথযোগী সাধকরা নিজেদের কান ছেদন করে বলয় বা কুণ্ডল ধারণ করেন বলে তাঁদের কানফাটা যোগী নামেও অভিহিত করা হয়। নাথপন্থার দর্শন ও সাধনপদ্ধতির মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় যোগসাধনা, তন্ত্রসাধনা, সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির কিছু কিছু উপাদান প্রবেশ করেছে। এছাড়াও 'নাথ' পদবিধারী যোগীসিদ্ধদের সঙ্গে 'পা' পদবিধারী যোগীসিদ্ধদের কিছু সাধনতত্ত্বগত পার্থক্য আছে। নাথপন্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান দ্বারা কালের গতি রোধ করে এই নশ্বর দেহকে অজর, অমর করে তোলা। মরদেহকে অমর করার এই পদ্ধতি উল্টাসাধন নামে পরিচিত। উল্টাসাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে খেচরী মুদ্রার ভূমিকাও নাথপন্থায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী একটা সময় পর্যন্ত নাথপন্থীরা বাংলায় যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত সেনযুগে জাতি ও বর্ণকাঠামো পুনর্গঠনের কালে নাথযোগীরা তাঁদের পূর্ব অবস্থান থেকে চ্যুত হন। জাতিবিচ্যুত যোগীরা পরবর্তীতে হিন্দু বর্ণকাঠামোয় প্রান্তিক হয়ে পড়েন। আধুনিককালে বঙ্গীয় যোগীজাতির মধ্যে যে বিভাগ ও উপবিভাগ লক্ষ করা যায় তা কখনও পেশাগত বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল আবার কখনও ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক। বাংলা নাথসাহিত্য মূলত দুটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেবী গৌরীর অভিশাপে মীননাথের অধঃপতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর উদ্ধার বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে গোরক্ষবিজয় বা গোর্খবিজয় ও মীনচেতন কাব্য। অন্যদিকে জননী ময়নামতীর অনুরোধে মেহেরকুলের রাজা গোপীচাঁদের সিদ্ধ হাড়িপার কাছে দীক্ষা গ্রহণের কাহিনি রূপ পেয়েছে গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, মাণিকচন্দ্র রাজার গীত প্রভৃতি ব্যালাডধর্মী কাব্যে। নাথসাহিত্যগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপকথাসদৃশ ও অলৌকিকতার আবরণে আচ্ছাদিত। তা সত্ত্বেও যোগতত্ত্ব, যোগদর্শন ও যোগসাধনপদ্ধতির একাধিক প্রসঙ্গ এখানে প্রকাশ পেয়েছে। রূপকের আড়ালে ব্যক্ত হয়েছে উল্টাসাধনের মাধ্যমে জড় দেহকে অমর করে তোলার প্রসঙ্গও।

ঐতিহাসিকভাবে নেপাল, তিব্বত ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নাথপন্থার সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। তবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নাথপন্থার সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় শৈবমতের। বর্তমানে নাথপন্থী জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ নিজেদের শৈব সম্প্রদায়ভুক্তই মনে করেন। এছাড়া বাংলায় নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে

ধর্মঠাকুরের উপাসক সম্প্রদায়ের যোগাযোগেরও একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে নাথপন্থার উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস, তার দার্শনিক তথা তাত্ত্বিক বিস্তার ও তার সাহিত্য সংরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে নাথপন্থী সাধকদের জীবনচর্যা ও সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনার পাশাপাশি বাংলার নাথযোগী বা 'যুগী' সম্প্রদায়ের প্রান্তিকায়ণের প্রেক্ষাপটটিও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতিতে নাথপন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ, শৈব ও ধর্মঠাকুরের উপাসকগোষ্ঠীর সম্পর্কসূত্রগুলোও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Discussion

ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দর্শন, সাধনতত্ত্ব, আচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পারস্পরিক আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ই নয়, আয়তন, প্রভাব ও ক্ষমতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অথচ ক্ষেত্রবিশেষে বহু প্রাচীন ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিও এই দেশের ঐতিহ্য নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের ধর্মীয় তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল নাথপন্থা। নাথপন্থার উদ্ভবের ইতিহাস এতটাই রহস্যময়তার আবরণে আবৃত যে সেই সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা নির্মাণ অত্যন্ত দুরূহ। ভারতবর্ষীয় যোগী সম্প্রদায়ের একাংশ দীক্ষান্তে তাঁদের নামের শেষে নাথ পদবি যুক্ত করায় নাথপন্থী রূপে পরিচিতি লাভ করেন। নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন:

> *"The Nath cult seems to represent a particular phase of the Siddha cult of India. This Siddha cult is very old religious cult with its main emphasis on a psychochemical process of yoga, known as the Kaya-sadhana or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal spiritual life."*[১]

যে যোগসাধনা নাথপন্থী যোগীদের প্রধান আচরণীয় বিষয় ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে সেই যোগধর্মের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত *গোর্খ বিজয়* -এর ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন যে *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ও *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ যোগসাধনার ইঙ্গিত আছে। এছাড়া *মহাভারত*, *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রভৃতি গ্রন্থেও যোগদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন ভারতীয় যোগদর্শনের সঙ্গে নাথপন্থার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও নাথপন্থার দর্শন ও সাধনপদ্ধতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

ভারতবর্ষে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী যোগীগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথের মাধ্যমেই নাথপন্থার প্রচার ঘটে। তাঁদের কেন্দ্র করে একাধিক কাহিনি ও উপকাহিনি বাংলা সহ ভারতবর্ষের একাধিক প্রদেশে প্রচলিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে সর্বাধিক প্রচলিত কিংবদন্তিটি হল যে কোনো এককালে শিব গৌরীকে সমুদ্রতীরে গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে মৎস্যেন্দ্রনাথ মাছের রূপ ধারণ করে তা শ্রবণ করলে শিবের দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হন। অভিশাপের প্রভাবে পরবর্তীকালে তিনি মহাজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে কদলীরাজ্যে বিলাসভোগে মত্ত হয়ে পড়লে শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁকে উদ্ধার করেন। এই উদ্ধারকাহিনিই বাংলায় প্রচলিত গোরক্ষবিজয় (মতান্তরে গোর্খবিজয়) ও মীনচেতন কাব্যের মূল উপজীব্য। আবার অন্যদিকে নেপাল থেকে আবিষ্কৃত *কৌলজ্ঞাননির্ণয়* পুথিতে মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানা যায় যে চন্দ্রদ্বীপে কুমার কার্তিকেয় শিবের মহাজ্ঞান হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে একটি মৎস্য তা উদরসাৎ করে। শিব তখন জাতিত্যাগ করে কৈবর্ত শ্রেণিভুক্ত হয়ে মৎস্যেন্দ্র রূপে সেই মাছটিকে বধ করেন ও মহাজ্ঞান পুনরুদ্ধার করেন। *কৌলজ্ঞাননির্ণয়* পুথি সম্পাদনাকালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই অলৌকিক কাহিনির রূপক বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-

> *"Matsyendra, though a Brahmin came to be called Matsyendra as he acted like a kaivartta i.e. a fisherman by killing the fish that had eaten up the sacred Kulagama."*[২]

নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দ্বিবিধ কাহিনি প্রচলিত আছে। বৌদ্ধমতে তিনি চতুর্থ অবলোকিতেশ্বরের অবতার ও ব্রাহ্মণ্যমতে তিনিই লোকেশ্বর শিব। কিন্তু এইসব অতিলৌকিক আখ্যানের আড়ালে মৎস্যেন্দ্রনাথ যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ও তাঁর উত্থান হয়েছিল এই বাংলা দেশেই সে সম্পর্কে একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথসম্প্রদায়ের আদিগুরু হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে শিষ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন অধিকতর পরিচিত। গোরক্ষনাথের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নাথযোগীদের মধ্যে একাধিক কাহিনি ও উপকাহিনি প্রচলিত। তিব্বতি গ্রন্থ *চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি* থেকে জানা যায় যে গোরক্ষনাথ ভারতের পূর্বাঞ্চলে দেবপাল নামক রাজার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করলেও রাজবৈভব ত্যাগ করে অরণ্যে গমন করেন ও পরবর্তীতে মহাযোগী অচিন্ত্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিব্বতি বৃত্তান্ত অনুযায়ী *"বহু ভক্তকে মোক্ষ দিতেন এবং গোরক্ষা করতেন বলে গোরক্ষ নামে তিনি সর্বদিকে খ্যাত হলেন।"* [৩]

গোরক্ষনাথের সঙ্গে সন্ত কবীর ও নানকের কথোপকথনের কিংবদন্তি বহু অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু সন্ত কবীর তাঁর *'বীজক'-এর ৪০ সংখ্যক শ্লোকে স্বীকার করেছেন যে বহু যুগ পূর্বেই গোরক্ষনাথের মৃত্যু ঘটায় স্থূলদেহে তাঁদের সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।"* [৪] কবীরের জীবৎকাল রূপে ষোড়শ শতাব্দীকে ধরে নিলে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে তার বহু পূর্বেই ঘটেছিল। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেশ্বর রচিত জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাভাষ্যে নাথযোগীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। *"জর্জ ওয়েস্টন ব্রিগ্‌স দেখিয়েছেন যে জ্ঞানেশ্বরের পিতামহ গোবিন্দপন্থের সঙ্গে গোরক্ষনাথের যোগাযোগ ছিল।"*[৫] সুতরাং গোরক্ষনাথের আবির্ভাব একাদশ শতাব্দীর পরে হতে পারে না। অন্যদিকে বাংলায় বিপুল জনপ্রিয় গোপীচন্দ্রের গানে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী ময়নামতীকে গোরক্ষের শিষ্যরূপে স্বীকার করে নিলে গোরক্ষনাথের আবির্ভাবকাল রূপে একাদশ শতাব্দী আরো যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে *"কারণ ময়নামতীর স্বামী মাণিকচন্দ্র ধর্ম্মপালের ভ্রাতারূপে খ্যাত এবং পালবংশের লোপ হয় একাদশ শতাব্দীতে।"* [৬]

নাথযোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কিত নিয়মাবলী ও নিষেধাজ্ঞা নিয়ে মতভেদ আছে। ধীনোধরের যোগীরা নিরামিষভোজী। কোনো কোনো অঞ্চলের যোগীদের মধ্যে মাংস ভক্ষণ নিন্দনীয় না হলেও নাথগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগসূত্রের কারণে মাছ ভক্ষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন-

> *"অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারিপ্রকার রস ও মৎস্য,মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইঁহাদের অভক্ষ্য। যব, গোধূম, ধান্য, দুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইঁহাদিগের সুপথ্য।"* [৭]

অক্ষয়কুমার দত্ত যোগীদের খাদ্যাখাদ্য বিষয়ক এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন *হঠপ্রদীপিকা* নামক হঠযোগ সাধনা সম্পর্কিত গ্রন্থ থেকে। হঠযোগী সাধকদের থেকে নাথযোগী সাধক বা সিদ্ধেরা কিছুটা আলাদা হওয়ায় নাথসিদ্ধদের মধ্যে খাদ্যাদি সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞার কিছুটা শিথিলতা লক্ষ করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ঐতিহ্যে যোগী শব্দটি কিঞ্চিৎ বৃহত্তর অর্থে প্রযুক্ত। সেই কারণে অন্যান্য যোগীদের থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা করতে নাথপন্থী যোগীরা কর্ণের উপাস্থি ভেদ করে ধাতু বা গণ্ডারের শৃঙ্গ নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করেন। কর্ণচ্ছেদ করে কুন্ডল ধারণের রীতি থেকেই গোরক্ষপন্থী নাথযোগীরা কানফাটা যোগী বা কন্‌ফট্ যোগী রূপে পরিচিত। নাথযোগীরা তাদের কর্ণে পরিহিত কুণ্ডলকে 'দর্শনী' নামে আখ্যায়িত করে থাকে। 'দর্শনী' নামের উৎস সম্পর্কে শ্রীকল্যাণী মল্লিকের বক্তব্য-

> *"কর্ণভেদ দ্বারা যোগজ সিদ্ধিলাভ হয় ও পরমাত্মা দর্শন হয় বলিয়া কুণ্ডলের অপর নাম দর্শনী।"* [৮]

ব্রিগ্‌স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Gorakhnath and Kanphata Yogis*-এ গোরক্ষপন্থী নাথযোগীদের কর্ণচ্ছেদন করে কুণ্ডল ধারণ অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা অনুসরণ করে জানা যায় যে কর্ণে কুণ্ডল পরিধানের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমেই গুরু তাঁর শিষ্যকে নাথত্বে বরণ করেন। কর্ণে পরিহিত বৃহদাকার এই বলয় বা কুণ্ডল কখনও মাটি, কখনও ধাতু, কখনও কাঠ আবার কখনও গণ্ডারের শৃঙ্গ দিয়ে তৈরি হয়। নাথপন্থীরা এই কুণ্ডল আমৃত্যু ধারণ করে থাকেন। কুণ্ডল ধারণের সংস্কার প্রসঙ্গে ব্রিগ্‌স জানান-

> *"A Yogi must protect himself from having his ring torn out. In the old days he whose ears had been mutilated, did not survive; he either died outright or was buried alive."* [৯]

কুণ্ডল ছাড়াও যোগীরা হাতে পিতল বা অন্যান্য ধাতু নির্মিত বলয় পরিধান করেন ও গলায় হিংলাজ বা আশাপুরী নামক বীজনির্মিত মালা বা রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেন। এছাড়া যোগীদের মধ্যে সেলী নামক ঔর্ণ ও শিংনাদ নামক কৃষ্ণবর্ণ শিং-এর তৈরি বংশী ধারণের রীতিও প্রচলিত। এই শিংনাদ পবিত্রী নামক বলয়াকার দ্রব্য থেকে লম্বিত হয়। গৈরিক বা শ্বেত বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, কপালে ত্রিপুণ্ড অঙ্কন ও শরীরে ভস্মলেপনের প্রথাও যোগীদের মধ্যে প্রচলিত।

নাথপন্থার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছিলেন-

> *"সাহিত্যিক ঐতিহ্যে নাথপন্থের যে দিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক যোগ ও তন্ত্র-সাধনার সূত্র প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে জট পাকাইয়া গিয়াছে।"* [১০]

বস্তুত নাথপন্থীদের সিদ্ধান্ত ও সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই বিষয়টি অত্যন্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। বাংলা নাথসাহিত্যের ধারা অনুসরণ করলে একটি বিষয় সহজেই ধরা পড়ে যে 'নাথ' পদবিধারী যোগীসিদ্ধ (যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ)-দের সঙ্গে 'পা' পদবিধারী যোগীসিদ্ধ (যেমন হাড়িপা, কানপা প্রমুখ)-দের সাধনতত্ত্বগত কিছু পার্থক্য ছিল। সুকুমার সেন অনুমান করেছেন যে এঁরা সম্ভবত নাথপন্থার দুই পৃথক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে-

> *"মীননাথ, গোর্খনাথের সম্প্রদায় ছিল একান্তভাবে নারীসঙ্গ বিবর্জিত জ্ঞানাশ্রিত যোগ-মার্গাবলম্বী। হাড়িপা-কানপার সম্প্রদায়ও যোগমার্গী ছিল কিন্তু তাহা পুরাপুরি জ্ঞানাশ্রিত ছিল না। তাহাতে তান্ত্রিক-সাধনা চলিত এবং নারী সাধিকার স্থানও ছিল।"* [১১]

বাংলায় সর্বাধিক প্রচলিত দুটি নাথ-কাহিনি অনুসরণ করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে একাধিক মতের প্রাধান্য সত্ত্বেও নাথপন্থার একটি মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি অবশ্যই ছিল যা এক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে যোগীজাতির স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখার সহায়ক হয়েছিল।

নাথপন্থার মূল তত্ত্ব হল বিন্দুধারণ, দেহশুদ্ধি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন ও আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কালের গতিকে জয় করা। যোগসাধনার দ্বারা 'সহজ' অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। সর্বতত্ত্বের ঊর্ধ্বে এই সহজের অবস্থান। সহজাবস্থায় ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের পৃথকভাব থাকে না, তা বাচ্য-বাচক ভেদরহিত। এই অবস্থায় যোগী ত্রিকালের অতীত হয়ে অজরত্ব-অমরত্ব লাভ করেন। *হঠপ্রদীপিকা* গ্রন্থে এই অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> *"মনোঃ স্থৈর্য্যে স্থিরো বায়ুস্ততো বিন্দুঃ স্থিরো ভবেৎ।*
> *বিন্দুস্থৈর্য্যাৎ সদা সত্ত্বং পিণ্ডস্থৈর্য্যং প্রজায়তে।।"* [১২]

অর্থাৎ মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হলে বিন্দু স্থির হয় ও বিন্দু স্থির হলেই পিণ্ড স্থির হয়।

নাথমতে সাম্যরসাত্মক সহজাবস্থা বা পরমপদ লাভের ক্ষেত্রে গুরুকৃপা একান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরু প্রদর্শিত পথেই স্বসংবেদ্য পরমপদের প্রাপ্তি সম্ভব। শ্রীকল্যাণী মল্লিক জানাচ্ছেন-

> *"সদ্‌গুরু পক্ষপাত বিনির্মুক্ত, বর্ণশ্রমাতীত, গুণাভিমান-রহিত ও সকল গুরুর গুরু।"* [১৩]

নাথপন্থায় ভবসমুদ্র পার হওয়ার কান্ডারি হলেন গুরু। নাথস্বরূপে আত্মসমর্পণের জন্য গুরুর আশ্রয়ই একমাত্র পথ। নাথপন্থা অনুযায়ী নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার ফলে জীব পরম সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই আবরণ শক্তি নানা রূপে বিরাজিত। জীব নিজ প্রচেষ্টায় সেইসব শক্তির আবরণ ভেদ করে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যোগসাধনের দ্বারা স্বরূপে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুক্তিলাভ সম্ভব। নাথপন্থা বিশ্বোত্তীর্ণ সাম্যাবস্থা থেকে গর্ভে ভ্রূণরূপে জীবের আবির্ভাব পর্যন্ত রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ষট্‌পিণ্ডের অস্তিত্ব কল্পনা করে। যোগতত্ত্বানুযায়ী মাতৃকুক্ষিতে জীব যে দেহ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে তার নাম গর্ভপিণ্ড। পিণ্ডতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই নাথসাহিত্যে প্রাণশঙ্কলি শাস্ত্রের সৃষ্টি। পিণ্ডতত্ত্বের মাধ্যমে যেমন জীবের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে তেমনই নিরাকার থেকে সাকার, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও কল্পনা করা হয়েছে। তন্ত্রমতে মানবদেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে শক্তি আছে সেই শক্তি মানবদেহেও

কুণ্ডলিনী রূপে বিরাজিত। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণই তন্ত্রের মূল কথা। তন্ত্রের এই ধারণা নাথপন্থাতেও গৃহীত হয়েছে। নাথমতে যোগসাধনাই সেই শক্তি জাগরণের মাধ্যম। শ্রীকল্যাণী মল্লিকের গ্রন্থ থেকে জানা যায়-

> *"পূর্ণরূপে জাগ্রতা কুণ্ডলিনী নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হইলে জগতের সমস্তই নিরাধারা হইয়া চৈতন্যময় হয়, তখন সর্বসত্ত্বই স্বস্বরূপে উপলব্ধ হয়।"* [১৪]

নাথপন্থায় শিব ও শক্তিতত্ত্বের মূল ধারণা তন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তির সঙ্গে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

> *"তন্ত্র শিবকে সৃষ্টির সার সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শিব অধিকারী, অবিনশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, অচল ও সনাতন।"* [১৫]

নাথপন্থীরাও জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় পরমকারণকে শিব বা আদিনাথ নামে অভিহিত করে থাকেন। নাথমতে

> *"তিনি স্বরূপতঃ অনাদি অনন্ত স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশ নিত্য বস্তু। দেশকালের অতীত, সুতরাং সর্ব্ব-অবচ্ছেদহীন এবং সকল ভেদ ও বাধাশূন্য।"* [১৬]

শক্তির সঙ্গে তিনি অন্যোন্যাশ্রয়যুক্ত ও তত্ত্বত অভিন্ন। শ্রীকল্যাণী মল্লিক তাঁর *নাথপন্থ* গ্রন্থে সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছেন তা অনুসরণ করে জানা যায় যে,

> *"নাদরূপিনী শক্তি মানবের মূলাধারে জড়তাপ্রাপ্ত হয়ে সুপ্ত থাকে। তাকে জড়তামুক্ত করে শরীরস্থ মধ্য নাড়ী সুষুম্নার পথে চালিত করতে হয়। এই পথেই মন শূন্যে নীত হয় ও জীবের 'শিবত্ব' লাভ ঘটে।"* [১৭]

নাথপন্থী সাধকদের সঙ্গে অন্যান্য যোগী সম্প্রদায়ের মূল পার্থক্য এই যে অন্যান্য যোগীরা পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের পর আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করে কিন্তু নাথযোগীরা জড় দেহকেই যোগসাধনার মাধ্যমে সিদ্ধদেহ বা দিব্যদেহে পরিণত করে। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন-

> *"The final aim of the Nath Siddhas is Jivan-mukti or liberation while living, and this state of liberation is what is meant by immortality."* [১৮]

মরদেহকে অজর-অমর করে তোলার জন্য নাথযোগীরা যে কায়সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করেন তা-ই উল্টাসাধন নামে পরিচিত। উল্টাসাধনের মাধ্যমে যোগী যেমন অধোমুখী শক্তিকে ঊর্ধ্বমুখী করে তোলেন তেমনই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কালপ্রবাহকে রুদ্ধ করে মরদেহকে সিদ্ধদেহে রূপান্তরিত করেন। নাথযোগীরা উল্টাসাধনার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্যের ধারণাকে সাহিত্যেও তুলে আনার চেষ্টা করেছেন বলে নাথসাহিত্যের কিছু অংশ পাঠকের কাছে বিরোধালঙ্কারে পরিপূর্ণ প্রহেলিকা বলে মনে হয়।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত *Obscure Religious Cults* গ্রন্থে উল্টাসাধন সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রদান করেছেন তা অনুসরণ করে দেখা যায় যে হঠযোগ সাধনায় আসন, ধৌতি, বদ্ধ, মুদ্রা, প্রাণায়াম সহ একাধিক উপায়ের মাধ্যমে শরীরের রূপান্তর সম্ভব। যোগের প্রধান কথা মানসিক সংযম। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর নিয়ন্ত্রণই সংযমের উপায়। অন্যান্য যোগীদের মতো নাথযোগীরাও সেইজন্য 'বায়ু' নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সংযমসাধনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। উল্টাসাধন বা কায়াসাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল খেচরী মুদ্রা। হঠ প্রদীপিকা গ্রন্থে খেচরী মুদ্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> *"ন রোগো মরণং তন্দ্রা ন নিদ্রা ন ক্ষুধা তৃষা।*
> *ন চ মূর্চ্ছা ভবেৎ তস্য যো মুদ্রাং বেত্তি খেচরীম।।"* [১৯]

নাথমতে জীব খেচরী মুদ্রা সাধন দ্বারা সহস্রার-ক্ষরিত অমৃত পান করলে তার পিণ্ডস্থৈর্য হয়। খেচরী মুদ্রাভ্যাসের মাধ্যমে সাধক সমস্ত রকম চিত্তবৃত্তি রোধ করে যোগমগ্ন অবস্থায় থাকতে পারেন।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নাথপন্থীদের সামাজিক অবস্থান ও প্রতিপত্তির সঙ্গে বাংলার নাথযোগী সম্প্রদায়ের তুলনা করলে দেখা যাবে যে বাংলায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের ইতিহাস ধর্ম-রাজনীতি ও সমাজ-রাজনীতির জটিল বৃত্ত দ্বারা আবৃত। সুকুমার সেনের মতে-

> *"নাথ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাঙ্গালা-কেন্দ্রিক পূর্বভারতে ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।"* [২০]

বঙ্গদেশ সহ সমগ্র পূর্বভারত জুড়ে একসময় এই যোগীজাতি অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শ্রীকল্যাণী মল্লিকের মতে-

> *"ইঁহারা রাজাদের গুরু ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করিতেন।"* [২১]

নাথসাহিত্যের আদি পর্বের বহু পুথির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার যোগ রয়েছে। পঞ্চানন মন্ডল তাঁর সম্পাদিত *গোর্খ বিজয়*-এর ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন যে সংস্কৃত যোগচিন্তামণির প্রণেতা ও টীকাকার দুজনই বাঙালি। পাঞ্জাবে প্রাপ্ত চৌরঙ্গিনাথের পুথির ভাষা পূর্বী মাগধী। গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনিও সম্ভবত বাংলা থেকেই সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং নাথপন্থী সাধকরা যে প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন সেকথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু বাংলায় নাথযোগীদের এই প্রতিপত্তি ও মর্যাদার ঐতিহ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে জাতি বা বর্ণকাঠামোর পুনর্গঠনের সময় নাথপন্থী যোগীরা তাঁদের পূর্ব অবস্থান থেকে চ্যুত হন এবং ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জাতিগত কাঠামোর একেবারে নিম্নস্তরে তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। এই জাতিচ্যুত হওয়ার প্রকৃত কারণ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে-

> *"ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কারণে নাথধর্ম ও সম্প্রদায় টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। ক্রমশ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিম্নস্তরে কোনও রকমে তাঁহারা নিজের স্থান করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।"* [২২]

নাথযোগী সম্প্রদায়ের এই অধঃপতনের ইতিহাস সম্পর্কে বুকানন বলেন যে শঙ্করাচার্যের শিষ্য এই যোগীজাতি অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্ত হয়ে পড়ায় শঙ্কর নিজেই তাদের জাতিচ্যুত করেন। সেই জাতিবিচ্যুত যোগীরা পরবর্তীতে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্গীয় যোগীজাতির জাতিচ্যুতি প্রসঙ্গে আরো একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তি হল বল্লাল সেন কর্তৃক তাদের অত্যাচারিত ও প্রান্তিকায়িত হওয়ার বৃত্তান্ত।

> *"দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের সঙ্গে যোগী পীতাম্বর নাথের মনোমালিন্যের পরিণতিস্বরূপ ক্ষুব্ধ রাজা সমগ্র যোগীজাতিকে পাতিত্যদোষে দুষ্ট করেন। বল্লাল চরিত গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।"* [২৩]

ফলস্বরূপ যোগীজাতির অনেকে অন্যান্য রাজ্যে চলে যান, কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এক বিপুল সংখ্যক মানুষ আত্মপরিচয় গোপন করে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়ে প্রাণ রক্ষা করেন।

বাংলায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের অধঃপতনের একাধিক সম্ভাব্য কারণ পণ্ডিতরা উল্লেখ করলেও এই সম্ভাবনাগুলির সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের অভাবে কেউই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। সাহিত্য, জনশ্রুতি, পুরাণ, কিংবদন্তি প্রভৃতি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বঙ্গীয় যোগী বা যুগীজাতি একসময় ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জাতিগত কাঠামোর উচ্চস্তরে বিরাজিত ছিলেন। অন্যদিকে প্রাক্-স্বাধীনতা কালের ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাংলায় যোগীজাতির অবস্থান ছিল সমাজের নিম্নস্তরে। এই জটিলতার কারণেই বঙ্গীয় যোগীজাতি প্রসঙ্গে এইচ.এইচ রিজলির নিম্নলিখিত মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হয়:

> *"On the evidence now available it is difficult to arrive at any definite conclusion regarding the manner in which the caste arose. There is nothing beyond the fact that they are generally looked down upon by Hindus, and follow a despised occupation to indicate a difference of race."* [২৪]
>
> *"বঙ্গীয় যোগীজাতির মধ্যে একাধিক উপবিভাগের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তারা শুধু পেশাগত দিক থেকেই আলাদা নয়, তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মকার্যও স্বতন্ত্র। বুকানন রংপুর জেলায় দুই শ্রেণির যোগীজাতির উল্লেখ করেছেন। একটি সম্প্রদায়ের নাম হেলুয়া বা হেলয় যারা কৃষিকাজ ও তন্তুবায়ের কাজ করে। অপর শাখাটির নাম থেলয় (কল্যাণী মল্লিকের মতে থিয়র) যারা মূলত ভিক্ষা করে ও চুন তৈরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।"* [২৫]

পূর্ববঙ্গে মাস্য ও একাদশী নামে দুই যোগী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন পন্ডিতেরা। তাঁদের নামকরণের পেছনে রয়েছে মৃত্যু পরবর্তী অশৌচ পালনের নিয়মজনিত সংস্কার। মাস্যরা অষ্টসিদ্ধার বংশধর ও একাদশীরা নাথ শিষ্যের বংশধর রূপে পরিচিত। বহুকাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যেমন অপ্রচলিত ছিল, তেমনই রেওয়াজ ছিল না পরস্পরের বাড়িতে জলগ্রহণের। শ্রীকল্যাণী মল্লিক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী-

> *"মাস্য যোগীরা ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও বিক্রমপুরের দক্ষিণে বাস করে। একাদশীরা বিক্রমপুরের উত্তরে ও অধিকাংশ ঢাকায় বাস করে।"* [২৬]

পেশাগত দিক থেকে বঙ্গীয় যোগী বা যুগী জাতির আরো বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন রিজলি। তাদের মধ্যে বয়নের সুতো রং করার কাজের সঙ্গে যুক্ত রংরেজ যুগী, তন্তুবয়নের সঙ্গে যুক্ত মনিহারী যুগী, চুন তৈরির কাজে লিপ্ত চুনোতি যুগী প্রভৃতির কথা উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারেও কিছুক্ষেত্রে যোগীজাতির নামকরণ নির্ধারিত হয়েছে। নোয়াখালির দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী যোগীরা সন্দ্বীপ নাথ ও সমতল স্থলভাগে বসবাসকারী যোগীরা ভুলুয়া নাথ নামে পরিচিত। বাংলার অনেকস্থানেই নাথযোগীরা রাঢ়ী, বৈদিক ও বারেন্দ্র এই তিনভাগে বিভক্ত। এছাড়া বর্ধমান জেলায় খেলিন্দ নামে যোগী সম্প্রদায়ের আর একটি উপবিভাগও লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকেও যোগীদের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র বিভাগ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের উপাসক ধর্মঘরিয়া যোগীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার নাথযোগী সম্প্রদায়ের এই বিভাগ ও উপবিভাগগুলি পর্যবেক্ষণ করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বাংলার নাথযোগীরা প্রাচীন ভারতীয় যোগতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যতটা না সম্পৃক্ত তার থেকে অনেক বেশি একটি স্বতন্ত্র জাতিগত বিভাগ (Caste) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জাত্যাভিমানপুষ্ট, ক্ষমতাশালী, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন যে নাথসম্প্রদায়ের কথা মিথমিশ্রিত ইতিহাস, পুরাণ ও লোককাহিনির হাত ধরে আমাদের কাছে আসে তাদের সঙ্গে বঙ্গীয় যোগীদের ব্যবধান দুস্তর। প্রামাণ্য ইতিহাস ও সাহিত্যে মধ্যযুগের বাংলা সহ অন্যান্য অঞ্চলে নাথপন্থী যোগীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে তারা ছিলেন পরিব্রাজক ও বেদাচার বহির্ভূত। বৈদিক প্রথা মেনে না চলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজে তাঁরা ছিলেন নিন্দিত। সেন যুগ পরবর্তীতে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তারা আরো প্রান্তিক হতে শুরু করেন।

বাংলা নাথসাহিত্য মূলত যে দুটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত তাদের মধ্যে একটি হল দেবী গৌরীর শাপে সিদ্ধ মীননাথের অধঃপতন ও সুযোগ্য শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর উদ্ধারের বৃত্তান্ত এবং অন্যটি হল জননী ময়নামতীর অনুরোধে মেহেরকুলের রাজা গোপীচাঁদের সিদ্ধ হাড়িপার কাছে দীক্ষা গ্রহণের বিবরণ। বাংলা ভাষায় রচিত গোরক্ষনাথের মহিমাব্যঞ্জক যে সমস্ত পুথি বর্তমানে গ্রন্থাকারে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

১. ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাস সেনের মীনচেতন গ্রন্থ।

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত মুন্‌শি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত শেখ ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয় কাব্য।

৩. বিশ্বভারতী থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত ড: পঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত ভীমসেনের গোর্খবিজয় কাব্য।

উপরিউক্ত তিনটি গ্রন্থেরই পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হলেও গীতিকা রূপে বহু প্রাচীনকাল থেকেই এর কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত ছিল। ক্রমশ একাধিক গায়েন ও লিপিকরের প্রক্ষেপণের ফলে কাব্যের প্রকৃত রচয়িতার পরিচয় নিয়ে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে জীর্ণ পুথিটি অবলম্বনে তাঁর গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করেছেন সেখানে শ্যামদাস সেনের নামে মাত্র দুটি ভণিতা রয়েছে। সেই পুথির আখ্যানভাগের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত পুথির আখ্যানভাগ প্রায় অভিন্ন। সম্পাদক করিম সাহেব তাই বলেছেন-

> *"আমাদের মতের উক্ত পুথি আর সমালোচ্য 'গোরক্ষবিজয়' অভিন্ন পুথি বই আর কিছুই নহে। পুথি দুইখানি পাশাপাশি রাখিলে স্বতঃই তাহাদিগকে যমজ বলিয়া পাঠকবর্গের ভ্রম হইবে।"* [২৭]

ফলে দুটি পুথি যে মূলত একই গ্রন্থের প্রতিলিপি সেকথা নিঃসংশয়ভাবে বলা যায়। আর এখানেই গ্রন্থের প্রকৃত লেখকের পরিচয় নিয়ে সংশয় আরো বৃদ্ধি পায়।

মুন্‌শী আবদুল করিম একাধিক পুথির সমন্বয়ে তাঁর *গোরক্ষবিজয়* গ্রন্থের পাঠ প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন পুথিতে যে তিনি শেখ ফয়জুল্লা ছাড়াও কবীন্দ্র দাস, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের ভণিতা লক্ষ করেছিলেন তা তিনি ভূমিকা অংশেই জানিয়েছেন। শ্যামদাস সেনের ভণিতা দুটি পুথির তিনটি মাত্র জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। ফলে তাঁকে প্রকৃত রচনাকার রূপে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। অন্যদিকে আবদুল করিম ও পঞ্চানন মন্ডল উভয়ের মতেই ভীমদাস (মতান্তরে ভীমসেন) ও কবীন্দ্র দাস প্রকৃতপক্ষে একই ব্যক্তি। কবীন্দ্র দাস বা ভীমদাস ও ফয়জুল্লার মধ্যে ফয়জুল্লার ভনিতা সংখ্যাই অধিক। এছাড়া গ্রন্থের ভাষা, ধর্মীয় চেতনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেও মুন্‌শি আবদুল করিম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কবীন্দ্র দাস এই গাথার আদি প্রচারক হলেও ফয়জুল্লাই তাঁর গাথাকে অবলম্বন করে এই কাহিনির গ্রন্থরূপ প্রচার করেন। গ্রন্থের রচয়িতার পরিচয় সম্পর্কে পঞ্চানন মন্ডলের বক্তব্য কিছুটা আলাদা। *গোর্খ বিজয়* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন-

> *"বহু বিঘোষিত ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেন অথবা আমাদের ভীমসেন রায় সকলেই মূল গোর্খ গীতিকার গায়ক মাত্র,; রচয়িতা নহেন।"* [২৮]

নাথ গীতিকার ঐতিহ্য ও পরম্পরা বিচার করে তাঁর এই মন্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না।

মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনি নিয়ে রচিত *মীনচেতন* বা *গোরক্ষবিজয়*-এর সঙ্গে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনি নিয়ে সৃষ্ট কাব্যগুলির একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। স্বতন্ত্র কাব্যরূপে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাব্যের লিখিত রূপ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গড়ে না উঠলেও গীতিকা বা ব্যালাড রূপে যে এই কাহিনি তার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই বাংলাদেশের লোকমানসে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-এর দ্বিতীয় খন্ডে জানিয়েছেন যে,

> *"জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যের যোগীখন্ডে গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনির উল্লেখ রয়েছে।"* [২৯]

গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনি নিয়ে রচিত যে কাব্যগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত *গোপীচন্দ্রের গান*। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীকে নিয়ে রচিত তিনটি আলাদা কাব্যের সংকলন। সেগুলি হল-

ক. রংপুরের কৃষক সম্প্রদায় থেকে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত 'গোপীচন্দ্রের গান'
খ. ভবানীদাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'
গ. সুকুর মামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস'

২. ঢাকা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত *গোপীচন্দ্রের গীত* ও *ময়নামতীর গান*

৩. শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত দুর্লভ মল্লিক রচিত *গোবিন্দচন্দ্র গীত*

৪. এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত জর্জ গ্রিয়ারসন সংকলিত *মাণিকচন্দ্র রাজার গান*

৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *গোপীচন্দ্র নাটক*

প্রধানত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেই ময়নামতী, মাণিকচন্দ্র ও গোপীচাঁদ বা গোপীচন্দ্রকে নিয়ে রচিত নাথগীতিকাগুলির প্রচলন ছিল। সর্বপ্রথম স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন্ রংপুর জেলায় প্রচলিত একটি গীতিকা সংগ্রহ করে *মাণিকচন্দ্র রাজার গান* নামে ১৮৭৩ সালে কলকাতা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র পত্রিকায় দেবনাগরী হরফে প্রকাশ করেন। এরপর ১৯১০-১১ সাল নাগাদ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় রংপুর অঞ্চল থেকেই এই গীতিকার আর একটি মৌখিক রূপ সংগ্রহ করে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'-য় প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক প্রথম যে সাহিত্যটি লিখিত আকারে পাওয়া যায় তা হল নেপালে পাটনের রাজা সিদ্ধিনরসিংহের রাজত্বকালে (১৬২০-১৬৫৭ খ্রিঃ) রচিত একটি নাটপালা, নাম *গোপীচন্দ্র নাটক*। বাংলায় প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে দুর্লভ মল্লিক রচিত গানটিই প্রাচীনতম। ভবানীদাস ও সুকুর মামুদ রচিত পুথিগুলির সময়কাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দী। গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর গানের মৌখিক রূপগুলি লোকসাহিত্যের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ীই অনেকবেশি আলুলায়িত, আবেগঘন ও কাব্যিক। তুলনায় একই

কাহিনির ওপর আধারিত একক ব্যক্তি দ্বারা রচিত কাব্যগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হলেও তত্ত্বভারাক্রান্ত। এই দুই প্রধান ধারার নাথসাহিত্য ছাড়াও বাংলা ভাষায় রচিত এমন আরো বেশ কিছু কাব্য, কাব্যাংশ, ছড়া, গান ইত্যাদি পাওয়া যায় যার মধ্যে নাথপন্থার জটিল তত্ত্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে সহদেব চক্রবর্তী ও দ্বিজ লক্ষ্মণের লেখা *অনিলপুরাণ*-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মঠাকুর ও ধর্মঠাকুরকেন্দ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে নাথপন্থার সংমিশ্রণের ইতিহাসে *অনিলপুরাণ* একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

নাথপন্থীদের সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন বাংলা নাথসাহিত্যে সেই সাধনতত্ত্ব কীভাবে উঠে এসেছে সে সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। নাথপন্থার মূল লক্ষ্য এই জরদেহে অমরত্ব লাভ। অমরত্বের সাধনাই নাথপন্থী যোগীদের ঘিরে অসংখ্য অতিলৌকিক কাহিনির জন্ম দিয়েছে। নাথপন্থীরা বিদেহ মুক্তির সাধক ছিলেন না। জর দেহ বা অপক্ক দেহকেই উল্টাসাধন বা কায়াসাধনের মাধ্যমে দিব্য দেহ বা সিদ্ধ দেহ বা পক্ক দেহে রূপান্তরই ছিল তাঁদের মূল অভীষ্ট। তাই *গোর্খ বিজয়* কাব্যের শুরুতেই দেবী মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বরকে প্রশ্ন করেন-

"তুমি কেনে থাক গোসাই আমি কেনে মরি।" [৩০]

এই অমরত্বের তত্ত্ব তথা মহাজ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন রানি ময়নামতী। ভবানী দাস রচিত *গোপীচন্দ্রের পাঁচালী* কাব্যে গোরক্ষনাথ কর্তৃক শিশু ময়নামতীকে মহাজ্ঞান-দীক্ষা প্রদানের উল্লেখ আছে। যথা:

"তবে জ্ঞান কহি দিল ব্রহ্মজ্ঞান বুলি।
যমের সহিতে রাজা কৈল কোলাকুলি।।
ময়নামতীর নামে লেখা ফেলিল ফাড়িয়া।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান কহে কর্ণতলে নিয়া।।" [৩১]

পুত্র গোপীচন্দ্রকে এই মহাজ্ঞান অর্জনের উদ্দেশে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণে প্রায় বাধ্য করে ময়নামতী। হাড়িপা কর্তৃক গোপীচন্দ্রকে মহাজ্ঞান প্রদানের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন কবি:

"সিদ্ধার যতেক জ্ঞান কহিল সকল।
অগ্নিতে না যাবে পোড়া পানিতে না হবে তল।।
চন্দ্র সূর্য মরণে জিবা বেলা আড়াই পহর।
পৃথিবী টলিবে না যাইবে যম ঘর।।" [৩২]

শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' প্রবন্ধে যোগতত্ত্ব বিষয়ে বলেছেন-

"দেহ মধ্যস্থিত প্রধান তিনটি নাড়ী, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্নাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী; এই তিন নদীর সঙ্গম স্থলই ত্রিবেণী।" [৩৩]

সুকুর মহম্মদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাব্যে এই ত্রিবেণীর ঘাটের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে:

"শিব শক্তি বলি কাকে কোন খানে ক্ষমা থাকে
কাকে বলি ত্রিবেণীর ঘাট।" [৩৪]

গোর্খ বিজয় কাব্যের নায়ক গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার প্রসঙ্গে কায়াসাধন তথা উল্টাসাধনের প্রসঙ্গ একাধিকবার উঠে এসেছে। ইড়া-পিঙ্গলার গতি রুদ্ধ করে সুষুম্নার পথে কুন্ডলিনী শক্তিকে উর্দ্ধমুখে নীত করলে দেহে মহারসের সঞ্চার ঘটার মধ্য দিয়ে আয়ু বৃদ্ধি পায় বলেই নাথপন্থী যোগীদের বিশ্বাস। অসংযত জীবনযাপনের ফলে গুরু মীননাথের দেহ জরাগ্রস্ত হলে শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁকে পুনরায় কায়-সাধনের পরামর্শ দিয়ে বলেন:

"উলটিয়া যোগ ধর আপনাক স্থির কর
নিজ মন্ত্র করহ স্মরণ
উলটি ধর আপনা ত্রিবেণীতে দেয় হানা
খালে জল ভরিতে কারণ।" [৩৫]

কিন্তু গোরক্ষনাথের অনুরোধ সত্ত্বেও যখন মীননাথ বলেন-

"উলটি সাধিতে যোগ গায়ে বল নাই" [৩৬]

তখন তাঁর এই বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে মৃদু তিরস্কার করে যে তত্ত্ববর্ণনা করেন তা-ই কায়-সাধনা বা উল্টা সাধনার ধ্রুববিন্দু। রূপকাশ্রিত ভাষায় রচিত সেই গূঢ়তত্ত্বের দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রদান এখানে অনাবশ্যক হওয়ায় উদাহরণস্বরূপ অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল:

"ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা,
মেরুমূলে লইয়া চন্দ্র নাচিব গোপালা।
বোঝ বোঝ গুরুজ্ঞান তত্ত্ব বোঝ সন্ধি,
রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী।
মন হএ পবন পবন হএ সাঞি,
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।" [৩৭]

নাথযোগীদের এই সাধনতত্ত্বের সঙ্গে যেমন বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধনতত্ত্ব ও শাক্ত-শৈব তান্ত্রিকদের সাধনার সাদৃশ্য আছে তেমনই পরবর্তীকালের বাউল-ফকির সম্প্রদায়, সূফি সম্প্রদায় ও সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও যোগ আছে। যদিও সাধনমার্গের মধ্যে সমতা থাকলেও অভীষ্ট লক্ষ্যের দিক থেকে নাথপন্থা স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়।

বৌদ্ধধর্ম যে সময় থেকে তন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিবিধ গূহ্য সাধনায় পর্যবসিত হচ্ছিল সে সময় থেকেই নাথপন্থার সঙ্গে তার তত্ত্বগত নৈকট্যের কারণে সাধারণ মানুষের চোখে দুইয়ের বিভাজনরেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছিল। তিব্বতী ঐতিহ্যে তাই চুরাশি সিদ্ধ রূপে পরিচিত আচার্যদের মধ্যে নাথপন্থার প্রথিতযশা সিদ্ধাচার্য মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরিপাদ, কানুপা, চৌরঙ্গীনাথ প্রমুখের নামও স্থান পেয়েছে। নাথগুরুদের মধ্যে অন্যতম প্রধান যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার রূপে পূজিত। মৎস্যেন্দ্রনাথ ছাড়া গোরক্ষনাথের সঙ্গেও বৌদ্ধধর্মের সংযোগ বর্তমান। কথিত আছে যে গোরক্ষনাথও পূর্বে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ও তাঁর নাম ছিল রমণবজ্র বা অনঙ্গবজ্র। স্বধর্ম ত্যাগ করে তিনি যোগধর্ম গ্রহণ করেন বলে নেপালে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁর প্রতি বিরূপ।

সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে নাথপন্থার সঙ্গে সবথেকে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় শৈবমতের। শৈব সম্প্রদায়, বিশেষত পাশুপত শৈব সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথপন্থার সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। বর্তমানে নাথপন্থী জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ নিজেদের শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করেন। নিজেদের তাঁরা পরিচয় দিয়ে থাকেন রূদ্রজ ব্রাহ্মণ রূপে। ভারতবর্ষের একাধিক স্থানে নাথপন্থীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী শিব বা আদিনাথের মাধ্যমেই নাথপন্থা এই মর্ত্যলোকে প্রথম প্রচারিত হয়। বাংলা নাথসাহিত্যে শিবকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগীসিদ্ধদের গুরুর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত *গোর্খ বিজয়* গ্রন্থে কখনো সরাসরি আবার কখনো পরোক্ষভাবে শিব হয়ে উঠেছেন নাথযোগী সম্প্রদায়ের আদিগুরু। সেখানে পাওয়া যায়-

"আদ্যে গুরু মহাদেব পিছে আর সব,
সাধন্ত সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব।" [৩৮]

বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগসাহিত্য থেকে শুরু করে নাথগীতিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথের যোগতত্ত্ব লাভের যে কাহিনি প্রচলিত আছে সেখানে মহাদেব বা শিব নিজের অজ্ঞাতসারে মীননাথকে মহাজ্ঞান প্রদান করেছেন। কাহিনি অনুসারে গৌরী শিবের কাছে 'মহাজ্ঞান' লাভ করতে চাইলে শিব তাঁকে সমুদ্রের ভেতর জলটুঙ্গীতে নিয়ে যান। মহাজ্ঞান প্রদানের সময় শিবের অগোচরে গৌরী নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লে মৎস্যেন্দ্রনাথ মাছের রূপ ধারণ করে কৌশলে সেই মহাজ্ঞান শ্রবণ করেন। *গোর্খবিজয়* কাব্যে পাওয়া যায়:

"হেটে থাকি মীননাথ হুঙ্কার পুরএ,
মহাদেবে জানে ভবানী মনে লএ।" [৩৯]

বাংলা নাথসাহিত্যের সঙ্গে ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক সাহিত্যের সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত *ধর্ম্মপূজাবিধান* নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ধর্ম-নিরঞ্জন সর্বদা যোগীন্দ্র সিদ্ধদের দ্বারা বন্দিত হন-

"ধর্ম্মাণামধিপং সদা দ্বিভূজকং যোগীন্দ্রসিদ্ধৈঃ স্তুতং।।" [৪০]

গ্রন্থের 'সাঙ্গব্যবস্থা'-য় নাথযোগী আদিনাথ, দীনানাথ (মীননাথ?), চৌরাঙ্গনাথ (চৌরঙ্গিনাথ), গোরনাথ (গোরক্ষনাথ)-এর প্রতি ফুল নিবেদন করা হয়েছে। ফুল নিবেদন করা হয়েছে সিদ্ধযোগিনীদেরও-

"সিদ্ধযোগিনীর পুষ্পং জয়।" [৪১]

ফুল নিবেদনের পাশাপাশি পৃথকভাবে সিদ্ধ যোগিনীদের বন্দনাও করা হয়েছে-

"ওঁ সিদ্ধ-যোগিনীভ্যো নমঃ।" [৪২]

ধর্ম্মপূজাবিধান-এর পাশাপাশি রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত *শূন্যপুরাণ*-এর 'অথ যজ্ঞ' অংশেও আদিনাথ, মীননাথ ও চৌরঙ্গিনাথের উল্লেখ আছে:

"আদ্যনাথ মিননাথ সিঙ্গা চরঙ্গিনাথ
দণ্ডপানি আর কিন্নরি।।" [৪৩]

বাংলায় ধর্মকাল্টের সঙ্গে নাথকাল্টের সমন্বয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ সহদেব চক্রবর্তী রচিত *অনিল পুরাণ*। দ্বিজ লক্ষ্মণের ভনিতাতেও সমনামের একটি পুথি পাওয়া গেছে। এই কাব্যটি ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যপ্রচারমূলক কাব্য হলেও এর তৃতীয় অধ্যায়ে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া যাদুনাথের *ধর্মপুরাণ*, দ্বিজ বিনয়লক্ষণের *হরমঙ্গল*, অজ্ঞাতনামা কবি রচিত *অনাদ্যচরিত্র* প্রভৃতি কাব্যেও ধর্মকাল্ট ও নাথপন্থার মিশ্রণ ঘটেছে। *ধর্মপূজাবিধান*-এর একাধিক পুথি নাথযোগীদের বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে। শ্যাম পন্ডিতের *নিরঞ্জন মঙ্গল*-এর দুটি পুথি ও যাদুনাথের *ধর্মপুরাণ*-এর একটিমাত্র পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে যুগীবাড়ি থেকেই। যাদুনাথ বা যাদবনাথ নিজেও নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন বলে পন্ডিতদের অনুমান। এছাড়াও নাথসাহিত্য ও ধর্মকাঠাকুর নির্ভর সাহিত্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা ঐতিহাসিকভাবে এই দুই সম্প্রদায়ের নৈকট্যকেই সূচিত করে।

নাথপন্থার ঐতিহ্য জটিল, বিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত। বাংলায় নাথপন্থার ধারা একাধিক অভিমুখে প্রবাহিত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীকে পরিপুষ্ট করেছে। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নাথপন্থা ও নাথসাহিত্যকে বাদ দিয়ে বাংলার ধর্ম, দর্শন, সাধনা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১. Dasgupta, Shashibhusan, Obscure Religious Cults, Calcutta, University of Calcutta, 1940, P. 192
২. Bagchi, Prabodh Chandra (Ed.), Kaulajnanana-Nirnaya and Some Minor Texts of the School of Matsyendranatha, Calcutta, Metropolitan Printing and Publishing House Limited, 1934, P. 6
৩. চট্টোপাধ্যায়, অলকা (অনু:), চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী, কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৬৭, পৃ. ৩১
৪. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ৩৪
৫. George Weston Briggs, Gorakhnath and The Kanphata Yogis, Calcutta, Y.M.C.A Publishing House, 1938, P. 234
৬. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ৩৬
৭. দত্ত, অক্ষয় কুমার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৮৯, পৃ. ১১৭-১১৮
৮. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথপন্থ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ. ১৯

৯. George Weston Briggs, Gorakhnath and The Kanphata Yogis, Calcutta, Y.M.C.A Publishing House, 1938, P. 8
১০. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১-গ
১১. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১-গ(ii)
১২. ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুচন্দ্র নাথ (সম্পা:), চিন্তামণি শ্রীস্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বিরচিত হঠ প্রদীপিকা, বর্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস, ১২৯৫, পৃ. ৯৫
১৩. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথপন্থ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ. ২৫
১৪. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ২২৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি, বাংলার তন্ত্র, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৯, পৃ. ৭৪-৭৫
১৬. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ২২৮
১৭. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথপন্থ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ. ৯৭
১৮. Dasgupta, Shashibhusan, Obscure Religious Cults, Calcutta, University of Calcutta. 1940, P. 219
১৯. ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুচন্দ্র নাথ (সম্পা:), চিন্তামণি শ্রীস্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বিরচিত হঠ প্রদীপিকা, বর্ধমান, বর্দ্ধমান প্রেস, ১২৯৫, পৃ. 88
২০. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ১-ক
২১. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথপন্থ, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৭, পৃ ১৪
২২. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৯, পৃ. ৫৩২
২৩. নাথ, রাধাগোবিন্দ, বঙ্গীয় যোগিজাতি, কলকাতা, আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ১৯১০, পৃ. ২৩-২৬
২৪. Risley, H.H., The Tribes and Castes of Bengal, Volume 1, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892, P. 356
২৫. Martin, Montgomery, The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Volume III, London, W^{M} H Allen and Co, 1838, P. 535
২৬. মল্লিক, শ্রীকল্যাণী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪৬, পৃ. ৯৫
২৭. আবদুল, করিম, মুনশী (সম্পা.), শেখ ফয়জুল্লা মরহুম প্রণীত গোরক্ষ-বিজয়, কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, ১৩২৪,পৃ. ৫
২৮. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ক-৫
২৯. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ, ১৩৯৮, পৃ. ১৯৯
৩০. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ৬
৩১. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ (সম্পা.), গোপীচন্দ্রের গান, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯ পৃ. ২৯১
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
৩৩. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ, ভারতীয় সাধনার ঐক্য, ভারতীয় সাধনা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪২৫, পৃ. ৬৯
৩৪. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ (সম্পা.), গোপীচন্দ্রের গান, কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ. ৪২২

৩৫. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ৭১-৭২
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩৮. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ৮
৩৯. মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.), গোর্খ বিজয়, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬, পৃ. ৭
৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল (সম্পা.), রামাই পণ্ডিত বিরচিত ধর্ম্মপূজাবিধান, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩, পৃ. ৭১
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৪৩. চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব (সম্পা.), রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ, কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৭